ঠাকুরমার ঝুলি : নির্বাচিত পাঠ-প্রতিক্রিয়া

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রকৃতিতে এটি রূপকথার সংকলন বলে পরিচিত। তা বলে রূপকথার 'রাজা-রানি', 'রাক্ষস-খোক্ষস', 'মন্ত্রী-সেপাই' ইত্যাদি যে ঠাকুরমার ঝুলি'র সব গল্পে পাওয়া যাবে তা কিন্তু নয়।

কাকে বলে রূপকথা? জার্মানে যাকে 'Marchen' বলে, বাংলায় আমরা তাকেই বলি 'রূপকথা'। অনেকের ধারণা, বাংলা সাহিত্যে লিখিত ভাবে 'রূপকথা' শব্দটি প্রয়োগ করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে (১৮৮৪)। কিন্তু এই তথ্য ঠিক নয়। প্রয়াত আচার্য সুকুমার সেন জানিয়েছেন 'রূপকথা' শব্দটির প্রয়োগ তিনি পেয়েছিলেন 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশের অন্তত দু'দশক পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি রচনায়, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' আলোচনার সূত্রে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিম-উপন্যাসে দেখি 'রূপকথা' ও 'উপকথা'কে বঙ্কিম অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন 'দেবী চৌধুরানী'তে বলেছেন—

ব্রজ : তা নয়—আর দুইটি ব্রাহ্মণী আছে জান ত?

ব্রহ্ম : ব্রাহ্মণী? মা মা মা, যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে—কেবল, রূপকথা বল—রূপকথা বল—রূপকথা বল। এই এত রূপকথা পাব কোথায়?

ব্রজ : রূপকথা থাক।

ব্রহ্ম : তুমি যেমন বলতে থাক, তারা ছাড়ে কই? বিহঙ্গামা বিহঙ্গামীর কথা জান? বলি শোন। এক বনে বড় একটা শিমূলগাছে এক বিহঙ্গামা বিহঙ্গামী থাকে।

কিন্তু যখন 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বলেন—

আশমানি বলিল, 'আমি একটি উপকথা বলি শুন। যতক্ষণ আমি উপকথা বলিব, ততক্ষণ তুমি ভাত মাখিবে, নইলে আমি খাইব না।

—দিগ্‌গজ। আচ্ছা।

—আশমানি এক রাজা আর তাহার দুয়ো সুয়ো দুই রানির গল্প আরম্ভ করিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া শুনিতে লাগিল—আর ভাত মাখিতে লাগিল—"

তখনও কি তিনি রূপকথাকেই বোঝাতে চাননি?

তা বলে 'রূপকথা' এবং 'উপকথা' যে এক নয় বলাই বাহুল্য। 'উপকথা' হল পশুপাখির চরিত্র নিয়ে রচিত গল্প। পশুপাখিরা এখানে মানুষের মতো কথা বলে, আচরণ করে। ইংরেজি 'Animal Tale'-কে বাংলায় 'উপকথা' বলে আখ্যা দিয়েছেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। এখন আমরা একে 'পশুপাখিকথা' বলে থাকি।

বিপরীত ভাবে রূপকথারও কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে হয় এই প্রসঙ্গে। রূপকথা বলার এক বিশেষ রীতি (style) আছে। 'এক রাজার সাত রানি', কিংবা 'এক তাঁতি, তার দুই স্ত্রী' অথবা 'এক রাজা আর এক মন্ত্রী'—এই ভাবে কারোর নামধাম না করে গল্প শুরু হয়। গোটা কাহিনিতে কারোর কোনো নাম থাকে না। উমনো-ঝুমনো, ইলাবতী-লীলাবতী, কাঞ্চনমালা-রতনমালা, লালকমল-নীলকমল নিছকই ব্যতিক্রম। রানিদের ক্ষেত্রেও বড়োরানি, ছোটো রানি ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের মতোই তারা কাপড় কাচেন, বাটনা বাটেন, কুটনো কাটেন। ইউরোপীয় প্রকরণগুলিতে অবশ্য রাজা-রানি-রাজপুত্র-রাজকন্যারা যে জীবনযাপন করেন তা হলো শ্রমবিহীন স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসের। আরো লক্ষ করি, রূপকথার পরিণতি কখনো বিয়োগান্ত হয় না। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে রাজপুত্র ঠিকই রাজকন্যাকে লাভ করে। রাজা ফিরে পায় তার সবকিছু। তারপর তারা 'সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরনা করতে লাগল'—এই হলো সব রূপকথার আনন্দময় পরিণতি। শুভ বনাম অশুভ শক্তির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত শুভশক্তিই জয় লাভ করে। যারা হিংসুটে কিংবা ক্ষতিকারক হয় তারা নানা শাস্তিভোগ করে। রাক্ষস-খোক্ষস প্রসঙ্গে একটি তত্ত্ব এই—তারা ক্যানিবাল বা নরমাংস আহারকারী জাতি। রূপকথায় তাদের আবির্ভাব অনেকটা প্রতিনায়ক রূপে। লক্ষ করলে আরো দেখা যাবে, রূপকথার যে কাহিনি তাতে একদিকে যেমন রোমান্স থাকে তেমনি অন্য দিকে নানা অলৌকিক বা ঐন্দ্রজালিক ঘটনা সংগঠিত হতে দেখা যায়। মানুষের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় রূপান্তরিত হওয়া, শিলধোয়া জল অথবা ডালিম ফল খেয়ে রানির সন্তান প্রসব, সাপের রূপে রাজপুত্র, জাদু আংটি, ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি তার কয়েকটি নিদর্শন। রূপকথায় থাকে ভাগ্য বা নিয়তির প্রাধান্য। মূল কাহিনির সঙ্গে কখনো বা এসে পড়ে নানান শাখা বা উপকাহিনিও। বলা হয়, রূপকথার আবেদনটি হয় শাশ্বত এবং তার মূলে কাজ করে মানুষের ইচ্ছাপূরণের তাগিদ। 'সমাজে এক একজন থাকেন, যিনি মনন-চতুরতা দৈহিক শক্তি ও আত্মত্যাগে অনন্য। সামাজিকতা তাদের গল্পের মধ্যে আনতে সচেষ্ট থাকেন।... রূপকথার নায়কেরা যে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের উপকার করে, পশুশক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে, বিপন্নকে উদ্ধার করে তার মূলে কাজ করেছে সমাজের ঐসব মানুষের প্রতি লোকসমাজের শ্রদ্ধা।' রূপকথায় থাকে এমন কিছু বাক্যাংশের ব্যবহার যা রূপক ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। 'চাঁদের পুতুল', 'দাঁতবিকটী রাক্ষসী', 'আজলাপুরা তেল', তার কয়েকটি নিদর্শন।

মাঝে মাঝে রূপকথায় মেলে গণনাপদ্ধতির সব ব্যাপার—'বারো হাত কাঁকুরের তের হাত বিচি', 'হাজার সুতোর আমগাছ', 'সাত-ছত্রিশ- কুঠুরী', 'তিন ছত্রিশ গালি', 'চার চোদ্দ ছাপ্পান্ন পাল' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। পরিণতিতে কোথাও বা মেলে একটি ক্রমপুঞ্জিত ছড়াও, কী এদেশ কী বিদেশ সর্বত্র। যেমন বাংলায়—

> আমার কথাটি ফুরাল/নটে গাছটি মুড়াল।/কেন রে নটে মুড়লি?/গোরুতে কেন খায়?/কেন রে গোরু খাস?/রাখাল কেন চরায় না?/কেন রে রাখাল চরাস না?/বউ কেন ভাত দেয় না?/কেনরে বউ ভাত দিস না?/কলাগাছ কেন পাতা ফেলে না?/কেনরে কলাগাছ পাতা ফেলিস না?/জল কেন হয় না?/কেন রে জল হোস না?/ব্যাঙ কেন ডাকে না?/কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না?/সাপে কেন খায়?/কেন রে সাপ খাস?/খাবার ধন খাবনি? গুড়গুড়তে যাবনি?

রূপকথা হয় চরিত্রে আন্তর্জাতিক, বলেছেন অনেকেই। যেমন ধরা যাক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র একটি রূপকথা 'সাত ভাই চম্পা'। কথাটির মেজাজ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কাহিনির মধ্যে মূল বিষয়টি হল ৭০৭ই। এই টাইপটি ধরে খুঁজলে গোটা পৃথিবীতে এই ধরনের লোককথার আন্তর্জাতিক আত্মীয়তা ও ইতিহাস সহজেই বেরিয়ে আসবে।

রূপকথা লোককথারই একটি সমৃদ্ধ বিভাগ। বাংলাদেশে লোককাহিনি সংগ্রহের সূত্রপাত ঘটে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এবং সত্যি কথা বলতে কী, ডি.এইচ. ড্যামান্টই বাংলাদেশের লোককাহিনিকে পাশ্চাত্য দেশের সামনে প্রথম তুলে ধরেন বলে মনে করেন অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী। কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে, সাময়িকপত্রে বাংলা লোককথাচর্চার সূচনা ড্যামান্টের বহু আগে শ্রীরামপুর মিশন থেকে অপর এক বিদেশীয় মিশনারী দ্বারা সম্পন্ন হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রথম বাংলা ভাষায় এদেশের সংগৃহীত লোককাহিনির প্রকাশনা ঘটে। অথচ কাব্যে উপেক্ষিতার ন্যায় মার্শম্যানকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব প্রদান করা হয় না। দ্বিতীয়ত, ড. চক্রবর্তী লিখেছেন, প্রথম একজন বাঙালি কর্তৃক বাংলা লোককথা সংগ্রহের গৌরব লালবিহারী দে-কে প্রদান করা বিধেয়। শুধু প্রথম বাঙালি কর্তৃক বাংলা লোককথা প্রকাশের জন্যই যে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন তা নয় "বাংলার অন্তঃপুরের শিশুদরবার থেকে রূপকথাকে বাইরে এনে বিশ্ববাসীর সামনে ধরে দেবার কৃতিত্ব তাঁরই।" কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য হলো, উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা'র অনেকগুলি গল্পকে যেমন খাঁটি লোককথা বলে সনাক্ত করেছেন প্রয়াত আচার্য সুকুমার সেন, তেমনি ৮টি গল্পকে খাঁটি রূপকথা বলে অভিহিত করেছেন ড. মলয় বসু। তাই যদি হয়, তাহলে প্রথম বাংলা রূপকথা সংগ্রহের কৃতিত্বও একজন বিদেশীয়কেই অর্পণ করতে হয়। তবে বাংলা রূপকথাকে প্রথম বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনার কৃতিত্ব যদি কোনো বাঙালির হয়ে থাকে তিনি লালবিহারী দে—একথা ঠিকই। কিন্তু প্রথম অবিমিশ্র বাংলা রূপকথার সংকলনের মর্যাদা নিশ্চয়ই তাঁকে প্রদান করা যায় না, সে কৃতিত্ব অর্পণ করতে হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর

'রাক্ষস-খোক্ষস' বইটির জন্যে। প্রকাশকাল ১৩০৪ বঙ্গাব্দ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যেমন প্রথম বাঙালি, যিনি অবিমিশ্র বাংলা রূপকথার প্রথম সংকলনটি প্রকাশ করেন, তেমনি ভারতীয় রূপকথার প্রথম সংকলক ছিলেন এলিজা ইসাবেলা ফ্রেরে। তিনি ইংল্যান্ডের মানুষ। তাঁর বইটির নাম Old Deccan Days, or Hindoo Fairy Legends, Current in Southern India.' প্রকাশকাল ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ। আর যদি বিশ্বে প্রথম রূপকথার সংগ্রহ ধরতে হয়, যেটি আবার প্রথম বিশ্বলোককথারও সংগ্রহ বটে, তার নাম বর্তমান গ্রন্থের গোড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে 'Kinderand-Hausmarchen'। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় ১৮১২ সালে এটি প্রকাশ করেন।

রূপকথাচর্চার এই ধারায় বাংলায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারও একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর জন্ম ঢাকার উলাইন গ্রামে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। পিতার নাম রমদারঞ্জন মিত্র এবং মাতা কুসুমময়ী দেবী। শৈশবে মাকে হারানোর পর তাঁকে দেখাশুনো করার দায়িত্ব বর্তায় পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর ওপর। জীবনের অনেকখানি সময় তাঁর গৃহতেই শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন হয়। তারপর ১৮৯৩ সালে তাঁকে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয় ঢাকারই জগন্নাথ কলেজিয়েট স্কুলে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুল এবং তারপর মুর্শিদাবাদ থেকে ১৮৯৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। খুব বেশিদূর অবশ্য তাঁর লেখাপড়া অগ্রসর হয়নি। তবে খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ লক্ষ করা গিয়েছিল। ইতোমধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল। পিসিমার কাছে ছোটোবেলা থেকে তিনি লালিতপালিত হলেও হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকে তিনি পিতার কাছে চলে এসেছিলেন। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন—

> ৩৫ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর পিতৃমাতৃহীন দক্ষিণারঞ্জন তাঁর বিধবা পিসিমার কাছে পুনরায় ফিরে যান এবং পিসিমাকে দেখাশুনা করা ছাড়া তাঁর সম্পত্তি দেখাশুনা করার দায়িত্বও তাঁরই ওপর বর্তায়। এই উপলক্ষেই তাঁকে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পর্যটন করতে যেতে হতো। আর এই গ্রামাঞ্চল পর্যটনের ফলেই তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকজীবনের সঙ্গে যেমন গভীর ভাবে পরিচিত হন, তেমনি এই সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীকালে যে তিনি লোককথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার পেছনে পিসিমার প্রভাব ছাড়া এই গ্রামাঞ্চল পর্যটন ও তজ্জনিত গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল স্বীকার করতে হবে।

ঠিক কথা।

কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের বয়স তখন ৩৫ ছিল না, ছিল ২৫ বছর।

কারণ লোককথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর 'অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা' পালনের সূত্রপাত ঠিক ২৯ বছর বয়সে। তখন ১৯০৬ বঙ্গাব্দ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারাটা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন উত্তাল। দীনেশচন্দ্র সেন দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর। দক্ষিণারঞ্জন স্বর্ণকুমারীকে তাঁর সংগৃহীত 'পুষ্পমালা' গল্পটি দিলেন। স্বর্ণকুমারী সেটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ

করলেন। এরপর দীনেশচন্দ্র দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন প্রকাশক ভট্টাচার্য এ্যান্ড সন্সের। তাঁরাই প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ঠাকুরমার ঝুলি'। প্রকাশকাল ১৯০৭। দক্ষিণারঞ্জনের বয়স তখন ঠিক ৩০ বছর, তারপর একে একে প্রকাশিত হল তাঁর 'ঠাকুরদার ঝুলি' (১৯০৮), 'ঠানদিদির থলে' (১৯০৯), 'দাদা মহাশয়ের থলে' (১৯১৩) ইত্যাদি। কাজেই পিতার মৃত্যুর পর যখন তিনি পিসিমার কাছে ফিরে যান তখন তাঁর বয়স ৩৫ ছিল না।

দক্ষিণারঞ্জনের প্রকাশিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্প সংখ্যা ১৪টি। এগুলি হলো যথাক্রমে—কলাবতী রাজকন্যা, ঘুমন্ত পরী, কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা, সাত ভাই চম্পা, শীত-বসন্ত, কিরণমালা, নীলকমল আর লালকমল, ডালিমকুমার, পাতালকন্যা মণিমালা, সোনার কাটী রূপার কাটী, শিয়াল পণ্ডিত, সুখু আর দুখু, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এবং দেড় আঙ্গুলে। গল্পগুলি যে সবই 'রূপকথা' নয় তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। গল্পগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

> ঠাকুরমার ঝুলিটির মতো এতো বড়ো স্বদেশি জিনিস আমাদের দেশে আর আছে কি? এখনকার কালের বিলাতের Fairy Tales আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানি একেবারে দেউলে... কিন্তু কোথায় গেল সেই রাজপুত্র... কোথায় বেঙ্গামা-বেঙ্গামী, কোথায় সাত সমুদ্র তের নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক।... স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল। দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়।... এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙালী বালকের চিহ্নক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে... ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

তারপর লিখলেন—

> দক্ষিণারঞ্জনবাবুকে ধন্যবাদ। তিনি 'ঠাকুমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন। তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু, তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু কথা হলো, দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র অবিকৃত ভাষার এই যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, সেই ভাষা কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন পরবর্তী সংস্করণে অনেকটাই বদলে ছিলেন। জনৈক গবেষক লিখেছেন, অক্ষয়কুমার সরকার এবং আরো অনেকের পরামর্শে সাধারণের বোধগম্য করার জন্যে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে গল্পগুলিকে তিনি পরিবর্তিত ভাষায় প্রকাশ করেন। যদিও একাজ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান অনুমোদিত নয়, তবু স্বীকার করতেই হবে—"এই বিষয়ে তিনি যে একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা পরবর্তী অনেক সংগ্রাহকই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সার্থক হইতে পারেন নাই।"